BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 39-50

একক মাতৃত্ব এবং সেলিনা হোসেনের দুটি গল্প

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী
কলেজ শিক্ষক
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উলুবেড়িয়া কলেজ
উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: robikobitito89@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ওপার বাংলার বরিষ্ঠ কথাকার সেলিনা হোসেন, সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে, দীর্ঘকাল ধরে তাঁর জনপ্রিয়তাও অব্যাহত। সমাজ-রাজনীতি এবং অর্থনীতির বহুমাত্রিক সমস্যা-সম্ভবনা ঠাঁই পেয়েছে তাঁর কথাভুবনে। একইভাবে সেলিনা হোসেনের কথানদীর বাঁকে বাঁকে নারীভাবনাতেও যুক্ত হয়েছে নিত্য নতুন ভাবনা; ব্যক্তিত্বে ও বৈভবে নারীর বহুমাত্রিকতা ধরা পড়েছে সেখানে। আর আধুনিক মানবতাবাদের বিশিষ্ট একটি পর্যায় যে মানবী-ভাবনা, সে সম্পর্কে গভীর সচেতন তিনি। বহতা সমাজের পট-পরিবর্তন ও নারীভাবনার বিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থেকেই কথাবিশ্বে মেয়েদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সমাজের বিবিধ শ্রেণির নারী বাস্তবতার সঙ্গে সেলিনা হোসেনের গল্পবিশ্বে জায়গা করে নিয়েছে, আবার প্রকাশ করেছে নিজেদের অনন্যতাও। তেমন বিশ শতকের একেবারে প্রান্তে এসে তিনি গল্পে এনেছেন একক মাতৃত্বের মত বিষয়কে, যা আজও সমাজের প্রতিটি স্তরে নির্দ্বিধায় গৃহীত হয়নি। অথচ তিনি একেবারে গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছেন গল্পে; এখানে আলোচনা করা হয়েছে লেখিকার দুটি গল্প- 'মতিজানের মেয়েরা' এবং 'পারুলের মা হওয়া'। আসলে দুই গ্রামীণ রমণীর এই বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্তের পিছনে আছে বধূ নির্যাতন ও উপেক্ষিত নারীর করুণ ইতিহাস; পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী আবহমান কাল ধরে যে যাপন-যন্ত্রণা ভোগ করে এসেছে, আলোচ্য গল্পগুলি তার বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদই জানায় না, উত্তরণের পথও দেখায়।

মূলশব্দ

সেলিনা হোসেন, ছোটগল্প, নারীভাবনা, নারী নির্যাতন, একক মাতৃত্ব, প্রতিবাদ

ভূমিকা

মহাভারতের কুন্তী- যাঁর মাতৃসত্তা ভারতীর সংস্কৃতিতে বহু চর্চিত একটি বিষয়। মহাভারতকে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রতিভা বসু তাঁর মহাভারতের মহারণ্যে গ্রন্থে কুন্তী চরিত্রের দিকে আলোকপাত করেছেন

এইভাবে–

> 'পতিবিয়োগে কুন্তী কাঁদেননি। কাঁদলেন, যখন সর্বসমক্ষে মৃতদেহ দুটি ভস্মে পরিণত হলো। এবং তিনি নির্দোষ বলে পরিগণিত হলেন। রচয়িতা আমাদের জানিয়ে দিলেন কুন্তীর ক্রন্দনে বনের পশুপাখিও ব্যথিত হয়ে পড়েছিলো। অথচ অকস্মাৎ দু-দুজন মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, স্বতঃই যখন মানুষের বক্ষ থেকে পাঁজরভাঙা ক্রন্দন উত্থিত হয় হয়, তখন তিনি নিঃশব্দ। কেন? এই জিজ্ঞাসারও কি কোনো জবাব আমরা পেয়েছি?'[১]

এই নীরবতার মধ্যেই হয়ত আছে কুন্তীর সন্তানধারণের প্রকৃত রহস্য। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এ কর্ণ তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন 'অর্জুনজননী' বলে; সেই কর্ণকেই সমাজ নিন্দার ভয়ে একদিন রাজনন্দিনী পৃথা কুমারী অবস্থায় গোপনে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের পথে। আবার তাঁরই অনবধানে মুখনিঃসৃত বাক্যের সত্যতা বজায় রাখতে অর্জুন-বিজিতা দ্রৌপদীকে একই সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের ঘরনী হতে হয়েছিল। তবে শুধু দ্রৌপদীর দাম্পত্যই নয়, সন্তানধারণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক যে নিয়মনীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, তাও কুন্তীর ললাট লিখনে অনুপস্থিত। তাই স্বামী পাণ্ডুর সন্তানের জন্মদানে অক্ষমতা এবং 'লিগ্যাসি' রক্ষার একান্ত বাসনায় কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দিতে হয়। এক্ষেত্রে দুর্বাশার আশীর্বাদ হয়েছে কুন্তীর সহায়ক। তবে বিবাহ পরবর্তীকালে সন্তান উৎপাদনের জন্য সঙ্গী নির্বাচনের দায়িত্ব তিনি স্বামীর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে নৃসিংপ্রসাদ ভাদুড়ী লিখেছিলেন–

> 'পাণ্ডুর কাছে কুন্তীর এই চরম আত্মনিবেদন এবং শরণাগতি যেমন তাঁর প্রথম যৌবনের গ্লানিটুকু ধুয়ে মুছে দেই, অন্যদিকে তেমনই দেবতা-পুরুষকে নিজে নির্বাচন করার স্বাধিকার ত্যাগ করে সমস্ত ভার পাণ্ডুর ওপর দিয়ে স্বামীর প্রতি একান্ত নিষ্ঠাও তিনি দেখাতে পেরেছেন। নিজের অনীপ্সিত সন্তানটির কথাও যে তিনি বলেননি- তাও পাণ্ডুর প্রতি নিষ্ঠাবশতই। পাণ্ডু যদি দুঃখ পান। স্বামীর সম্মতি ছাড়া একাই তিনি উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হতে পারেন- এই স্বাধিকার যদি পাণ্ডুকে আহত করে- তাই কন্যাবস্থায় তাঁর পুত্রজন্মের কথাও উল্লেখ করেননি এবং এখনও তিনি নিজের ইচ্ছায় কাজ করছেন না, করেছেন পাণ্ডুর ইচ্ছায়, তাঁরই নির্বাচনে।'[২]

এখানে অবশ্য কুন্তীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অবকাশ কতখানি ছিল, তা অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ রাখে। কারণ একটি প্রজন্ম পিছিয়ে গেলেই দেখা যায় সেখানে সত্যবতী ও ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে অম্বিকা ও অম্বালিকাকে ব্যাসের ঔরসে ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দিতে হয়েছে, সেখানে কাশী-রাজকন্যা তথা হস্তিনাপুরের বিধবা রাজবধূদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় পায়নি। আর এই একুশ শতকে ঈলিনা বণিক তাঁর 'কুন্তীকথা' প্রবন্ধে লেখেন–

> 'আসলে পরিবার ব্যবস্থা এক ধরনের সম্পত্তির অধিকার সঞ্জাত। বিবাহ প্রথায় নারী হয়ে যায় পুরুষের সম্পত্তির অংশ। পুরুষ তার পদবী দিয়ে নারীর নাম, পদবি গ্রাস বা অধিকার করতে চায়। সন্তানরা হয় পুরুষের সন্তান। কারণ তারা পুরুষের পদবি পায় উত্তরাধিকার সূত্রে। স্থাবর সম্পত্তি, ক্ষেত খামার, গবাদি পশুরই মতো বিবাহিত নারীও হয়ে যায় পুরুষের সম্পত্তি, তার অধিকৃত। তাই নারীর অধিকার নেই অন্য পুরুষের বীর্য গ্রহণ করে অন্য পুরুষের ঔরসজাত সন্তান ধারণ করার। নারী বাধ্য কেবলমাত্র বিবাহিত স্বামীরই

> ঔরসজাত সন্তান ধারণ করতে। এই প্রথা চলে আসছে প্রাচীন যুগ থেকে। পরিবার ব্যবস্থা আরম্ভ যে সময়ে। মহাভারতের যুগে কুন্তীকেও পাণ্ডুর মালিকানা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।'[৩]

বিশ-একুশের বিশিষ্ট কথাকার সেলিনা হোসেনের 'মতিজানের মেয়েরা' এবং 'পারুলের মা হওয়া'- দুটি গল্পেই লেখিকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মাঝেও নারীর একক মাতৃত্ব এবং মেয়েদের যৌনস্বাধীনতার দিকটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গল্পদুটিতে যে নারীদের আশ্রয় করে এমন বৈপ্লবিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত বা উচ্চবিত্ত সমাজের নারী নয়। অতি সাধারণ গ্রামীণ নারীদের মধ্যে দিয়ে এই প্রতিবাদের স্বর তিনি শুনিয়েছেন, তা পাঠকের কাছে শুধু অভিনবই নয়, নারীচেতনার গতিপ্রকৃতি এবং সময়ের বাঁকবদল সম্পর্কে সচেতন করে দেয় পাঠককে।

বিশ্লেষণ

সেলিনা হোসেনের সাহিত্য সাধনা ভীষণভাবে 'প্রাণিত' হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা। তাঁর ইতিহাস চেতনা ও ঐতিহ্যপ্রিয়তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সমগ্র সাহিত্যভুবনে। প্রাগাধুনিক সাহিত্যের বিনির্মাণ থেকে কবিজীবনের নবপাঠ সমৃদ্ধ করেছে সেলিনা হোসেনের কথাবিশ্বকে। এসবের পাশাপাশি নারীভাবনায় সমকালীন সাহিত্যের এক অগ্রগণ্য সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, কারণ- 'নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে না দেখে তিনি দেখেছেন সামাজিক জেন্ডার দৃষ্টিকোণে। ফলে তাঁর নারীরা হতে পেরেছে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত ও স্বাধীন নির্বাচনক্ষম।'[৪] এই সূত্র ধরেই বিশ্বজিৎ ঘোষ আরও জানাচ্ছেন–

> 'সেলিনা হোসেন তাঁর গল্পে প্রত্যাশা করেছেন নারীর অনেকান্ত উত্থান- তবে সে উত্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিনির্ভর। সামাজিক নির্ভর না হয়ে ব্যক্তিনির্ভর হওয়ার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর নারীরা পরিণতিতে হয়ে পড়ে স্তব্ধ, নির্বাক কিংবা মৌন। তবে ছোটগল্পে নারী অভিজ্ঞতার রূপায়নে সেলিনার সিদ্ধি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'মতিজানের মেয়েরা' সংকলনভুক্ত গল্পগুলোর কথা স্মরণ করা যায়।'[৫]

যেহেতু গল্প-সংকলনের নাম *মতিজানের মেয়েরা* সেহেতু গল্পটির গুরুত্ব সংকলনে এবং লেখিকার মনে বিশেষ জায়গা নিয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি দেশে-বিদেশে 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পটি যে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল, সেকথা লেখিকা নিজেও উল্লেখ করেছেন। গল্পগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৯৫, অর্থাৎ বিশ শতকের শেষ পর্বে গল্পটি লিখেছিলেন সেলিনা হোসেন।

অন্যান্য মেয়েদের মতো আশা-স্বপ্ন নিয়ে সংসার করতে এসেছিল মতিজান। শ্বশুরবাড়ির সংসার তেমন জমাটি নয়। মাথার ওপরে আছে বিধবা শাশুড়ি, ছেলের জন্মের দেড় বছরের মধ্যেই বিধবা হয়েছিল গুলনুর। কারোর সাহায্য ছাড়াই স্বামীর ভিটেমাটি আগলে একাই ছেলে আবুলকে বড় করেছে। সংসারে নিজের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে সওদা সচেতন সে। সংসারে শাশুড়ির আধিপত্যের বিষয়টি খুব নতুন কিছু নয়। হাসান আজিজুল হকের আগুনপাখি উপন্যাসে নামহীনা কথকের শাশুড়িকেও এভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছিল; তিনি ছিলেন একাধিক সন্তানের জননী, পুত্রবধূর কথায়–

> '...যা করবার, যা বলবার, গিন্নি করবে, গিন্নি বলবে। আর সি কি যে সে গিন্নি! এটুকুন মানুষ, শাদা শাড়িতে

> কপাল পর্যন্ত ঢাকা, শরীলের কোথাও এতটুকু ধুলোবালি লেগে নাই। এত পোস্কার থেকে কেমন করে মানুষ তাই ভাবতাম। মুখে একটি-দুটি কথা, ভালোবেসেও নয়, মন্দবেসেও নয়। আর না-পচন্দ কুনো কিছু করলে দু-একটি বাক্যি যা বলত তা যেন কল্‌জে ছ্যাঁদা করে দিত। এইটোতেই ভয় লাগত বেশি। তবে বিচের ছিল বটে। একটি অন্যায় কাজ লয়, অন্যায্য কথা নয়। কুনো কিছু নিয়ে দুই দুই করা লয়। একেবারে সুক্ষ্ম ষোলো আনা ন্যায্য বিচের।'[৬]

এই 'ন্যায্য বিচের'-এর সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান মতিজানের শাশুড়ি গুলনুরের। এই জাঁদরেল মহিলার সংসারে শুধু মতিজান নয়, গুলনুরের নিজের ছেলে আবুলও 'বাড়তি মানুষ'। যথারীতি একমাত্র পুত্রবধূর ওপর নির্মম নির্যাতন চালায় গুলনুর। মনে পড়ে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' ছোটগল্পের কথা, সেখানে রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ নিরুপমার শ্বশুরবাড়িতে খাওয়াপরার অযত্নের প্রসঙ্গ তুললে শাশুড়ির প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দিত–

> 'বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নেই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।'[৭]

অর্থাৎ নিরুপমার বাবা রামসুন্দর মিত্র রায়বাহাদুরের চাহিদা মতো পণ মেটাতে সমর্থ ছিলেন না, যার ফলশ্রুতি মেয়ের অকালমৃত্যু। পরবর্তীকালে সবুজপত্র পর্বে, রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনার একটি বিশেষ পর্যায়ে হৈমন্তীর বাবা গৌরীশংকরের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক পরিচয় পেয়ে তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের আচরণও ছিল অনুরূপ। সেখানে কথক তথা হৈমন্তীর স্বামী নিজের পত্নীর মৃত্যুসংবাদ না দিতে পারলেও পুনর্বিবাহের জন্য মায়ের পাত্রীর সন্ধান হৈমন্তীর করুণ পরিণতি সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে দেন। এভাবে শুধু যুগ নয়, পেরিয়ে যায় শতকও। যৌতুক হিসেবে সাইকেল আর ঘড়ি দিতে না পারার জন্য গুলনুর শুধু মতিজানের বাপ-ভাইকে গালমন্দ করেই ছাড়েনি, নিজের পুত্রবধূকে ভাত খেতে না দিয়ে পোষা জন্তুর মতো ঘরের খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে, সন্ধের সময় ডোবার ধারে নিয়ে গিয়ে মতিজানের মুখ গুঁজে দেয় ঘাসে- 'হামি আর তুমহাক ভাত খ্যাওয়াবার প্যারমো না। খ্যা, খ্যা, ঘাস খ্যা।' আর এই দেখে মায়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে রসুল চলে যায় গঞ্জে তার 'বাঁধা-মেয়ে' রসুইয়ের কাছে।

২০১৬ সালে প্রকাশ পেয়েছিল তিলোত্তমা মজুমদারের উপন্যাস প্রেতযোনি; বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেই আখ্যানে অভিজাত পরিবারের মেয়ে নীপা স্বেচ্ছায় ঢালিবাড়ির বউ হয়ে গিয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। তার স্বামী মনোজ, সঙ্গমের নামে রাতের পর রাত নিজের স্ত্রীকে ধর্ষণ করে যায়, বিপত্নীক ভাসুর গভীর রাতে হানা দেয় ভাইয়ের স্ত্রীর বিছানায়, শাশুড়ি নিজের ভাসুরপোর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত, বড়-জা পূর্ণিমাকে নীপার বিয়ের আগেই ঠেলে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুর দিকে, নীপার একমাত্র সন্তানকেও কেড়ে নিয়েছিল তার শাশুড়ি। আর এসবের প্রতিবাদ করতে গেলেই তার পিঠে পড়ে শাশুড়ির নির্মম চাবুক–

> 'তার কান্না শুনে ছুটে আসবে সে সাহস কারও নেই। শাসুউ-ন শাসুউ-ন শাসুউ-ন বাতাসে ছড়ি কাটার শব্দে কী ঘটছে তা আন্দাজ করা যাচ্ছিল। শাসন শাসন শাসন! নিজের যথেচ্ছাচার ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গেলে এমন শাসন রাখতেই হয়। এভাবে চুপ করিয়ে দিতে হয় প্রতিবাদের কণ্ঠ। রাজনৈতিক নেত্রী রাজ্যশাসনের

> নামে করেন, বেশ্যাপাড়ার কর্ত্রী ব্যাবসা কায়েম রাখার জন্য করেন, দজ্জাল শাশুড়ি সংসারে শৃঙ্খলা রক্ষার নামে করেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দাঁড়াবে একই রকম।'[৮]

এরকমই এক পটভূমিকায় মতিজানের প্রতি চরম আক্রোশ শাশুড়ি গুলনুরের। যার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে মতিজানের চরিত্রেও, সে-ও হয়ে উঠতে চায় 'শক্ত মেয়েমানুষ', তার সামনে প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে একজনই 'যে শক্ত ম্যায়্যামানুষ বলে' গ্রামে পরিচিত- অর্থাৎ শাশুড়ি গুলনুর।

হয়ত মতিজানের জীবন একটু সহজ ছন্দে চলতে পারত, যদি স্বামী আবুলের জীবন-যাপন হত স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানেও তো চরম প্রতিবন্ধকতা। স্বামীর ওপর শাশুড়ির আধিপত্য ছাড়াও আবুল আসক্ত অন্য নারীতে। বেশিরভাগ সময়টা সেই রসুইয়ের ঘরেই কাটায়। আর সংসার সম্পর্কে তার বক্তব্য- 'হামক কিছু কব্যা না। হামি কিছু জানি না। কিছু করব্যার পারম্যো না। মা হামার বুকের মদ্যি পা থ্যুয়া চ্যাপা র্যাখছে।' তার মুখ সর্বদাই ভরে থাকে অশ্লীল গালিগালাজে, যদিও সেগুলি কাকে উদ্দেশ্য করে বলে, তা ঠিক বোঝা যায় না। আবুলকে চিনতে মতিজানের অসুবিধে হয় না- 'উদ্ভ্রান্ত চেহারা, রক্তাভ চোখ, সংসার সম্পর্কে উদাসীন। সংসারের ধার ধারে না। ওর গাঁজার আড্ডা আছে, মাস্তানি আছে, পকেটে টাকা নিয়ে গঞ্জের রসুইয়ের ঘরে ঢুকে পড়ে অনায়াসে। ওর কাছে মা কিছু নয়, বউও কিছু নয়'। সে কারণে 'মাতাল, জুয়াড়ি, পরনারী-আসক্ত স্বামীর জন্য' তার মনে বিশেষ কোনো অনুভূতি জাগে না। বরং নিজের ব্যক্তিত্বকে মজবুত করতে চায় মতিজান শাশুড়ির পতিপক্ষ হয়ে ওঠার জন্য।

মতিজান গ্রামের সাধারণ মেয়ে। বাবা দরিদ্র, তবু নিজের আত্মসম্মানবোধ তার মধ্যে কাজ করে সব সময়ই। বিয়ে করতেও সে চায়নি। দরিদ্র বাবার ভার না হয়ে গ্রামের সমবায়ে রেলি বুয়ার সঙ্গে নকশি কাঁথার কাজ শুরু করেছিল। সেভাবেই কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল স্বাধীন জীবন। কিন্তু 'মানসম্মান' রক্ষার তাগিদে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা 'মিথ্যুক আর ঠগ' হয়ে গেছেন। আর মতিজানের অবস্থা তো 'মানহারা মানবী'র মতোই। তার বড় ভাই আর বাবা, জামাইয়ের জন্য ঘড়ি আর সাইকেল কেনার ব্যবস্থা করতে চাইলেও সেখানে বাধ সেধেছে স্বয়ং মতিজান-বাপ ভায়ের বদনাম তো হয়েইছে, তাকে গরুর মতো ঘাসও খেতে হয়েছে, মান-সম্মানের অবশিষ্ট আর তো কিছুই নেই- এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মতিজান। নিজের কষ্টের সঙ্গে মিশে যায় আপনজনদের অপমানও। 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমার বাবা বাড়ি বিক্রি করে রায়বাহাদুরের টাকা মেটাতে চেয়েছিলেন। দাদা মারফৎ সেকথা জানতে পেরে বাবার সম্মুখে প্রতিবাদিনী হয়ে উঠেছিল শান্ত নিরুপমাও–

> 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান! তোমার মেয়ের কী কোনো মর্যাদা নেই? আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, এ-টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না।'[৯]

এরকম অপমানের যন্ত্রণা বুকে চেপে সংসারের কাজ করে মতিজানও, 'বুকের ভিতর উপেক্ষা করার শক্তি শক্ত হয়ে যায়'। তাই দুপুরের খাবার খেতে গেলে গুলনুর যখন তাকে বাধা দেয়, সেই বাধাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সানকিতে রাখা ভাত খেয়ে নেয়। এমনভাবে সানকি ধরে, যাতে গুলনুর খাওয়ায় ভাধা দিলে যে সানকি ছুঁড়ে শাশুড়িকে মারতে পারে। এমনকি স্বামীর জন্য রাখা বড় মাছের টুকরোও নিজে নিয়ে নেয়। এভাবেই 'নিজের অধিকার' মতিজান বুঝে নিতে থাকে। শাশুড়ির পরাজয়ে মতিজানের 'বুকের ভেতরে জয়ের মহানন্দা', যেন

'ঘন কুয়াশার আবরণ ছিঁড়ে' বেরিয়ে আসতে চায়।

এসবের পরেও নিজের ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতাকে অতিক্রম করতে পারে না। সংসারে ঊনকোটি-চৌষট্টি কাজ, ছেলেমানুষ বুধের সঙ্গে গল্পগাছা করেও 'ব্যাপক শূন্যতা' গ্রাস করে মতিজানকে। সে জানে তার স্বামী অন্য নারীর ঘরে 'সব লুটছে'। অথচ বিয়ের বছর ঘুরে গেলেও নিজের কোল খালি। মতিজানকে 'বাঁজা মেয়েমানুষ' তকমা দিতে দেরি করে না শাশুড়ি। শাশুড়ির অত্যাচারের যন্ত্রণা অতিক্রম করে গেলেও, মা হতে না পারার বেদনায় ভারি হয়ে ওঠে মতিজানের মন। প্রতিবেশিনীর সমর্থনে ছেলের দ্বিতীয় বিয়ের কথাও শুনিয়ে দেয়। আর মতিজান যখন আবুলের কাছে এই বংশরক্ষার প্রসঙ্গ তোলে, স্বামীর প্রতিক্রিয়া- 'বংশের পোঁদে লাথ্‌থি'। এমন গালি সে দেয়, যে মতিজান 'বেকুব বনে যায়'। গাঁজায় চুর হয়ে থাকা স্বামীকে 'লাথি দিয়ে ফেলে দিতে চায়' সে। মতিজানের এই মানসিকতা প্রথাগত সংস্কার আর নারী-অবদমনের বিরুদ্ধে প্রাহমিক বিদ্রোহ। সেলিনা হোসেন তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে নারী-ভাবনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন ওয়ালীউল্লাহের *লালসালু* উপন্যাসে জমিলা কিভাবে তার স্বামী মজিদকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই ঘটনাটি। মজিদের বিছানায় সে যায় না, স্নেহশীলা সতীনের কাছেই যে থাকে। মাজারের ভণ্ড পীর তথা চতুর ধর্মব্যবসায়ী স্বামীর গায়ে থুতু দিয়েছিল জামিলা–

> 'মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটা কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেই দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।'[১০]

বিশ শতকের মধ্যপর্বে যে 'অস্বাভাবিক' ঘটনা জমিলা ঘটিয়েছিল, প্রায় অর্ধশতক পরে মতিজান এগিয়ে গেছে আরও অনেকখানি। স্বামীর গাঁজার গন্ধেই সে ভিতরে ভিতরে উপলব্ধি করে অন্য পুরুষকে- 'লোকমানের দীর্ঘ, ছিপছিপে শরীরটা ওর হাতের কাছে চলে আসে। ও ছুঁয়ে দেখার জন্য হাত বাড়ায়। এবং সেই শরীরটা ওর মুঠোর মধ্যে পুঁটুলি পাকিয়ে ঢুকে যায়।'

সাহসী হয়ে ওঠে মতিজান। শাশুড়ি গেছে ভাসুরের বাড়ি, বুধে ছেলেটিও নেই কাছাকাছি। নির্জনতার সুযোগে ঝড়ের দুপুরে সে মিলিত হয় লোকমানের সঙ্গে। লোকমানের প্রতি একটি মানসিক টান তার আগেই তৈরি হয়েছিল। তাই নির্জন দুপুরে তাঁরই জন্য রুমালে ফুল তোলে মতিজান। লোকমানের সঙ্গে সঙ্গমে গর্ভবতী হয়ে পড়ে সে- 'একলা ঘরে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া- একলা ঘরে নিজের সঙ্গে উথাল পাথাল। মতিজানের সব বদ্ধ দরজা খুলে যায়।' স্বামী বাঁকা চোখে তাকালেও বিশেষ কিছু ব'লে না বরং পুরানো রসুইকে ছেড়ে সে তখন অন্য নারী নিয়ে ব্যস্ত। শাশুড়ি ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে দেবার সুযোগ হারিয়ে থম হয়ে যায়। পরে অবশ্য 'পুরুষ ছাওয়াল'এর দাবি তোলে। শেষ পর্যন্ত বংশরক্ষা হয় না অবশ্য- 'নারীহিংসার দেশে' কন্যা সন্তানের জন্ম দেই মতিজান। গুলনুর নাতনির মুখও দেখেনি। কিন্তু চারিদিকের এই অবহেলা-উপেক্ষার পরেও 'এক অন্তহীন আনন্দের মহানন্দা' মতিজানের 'চারপাশে থই থই করে'। শাশুড়ি যত 'মারমুখী হিংস্র' হয়ে ওঠে, মতিজান মানসিকভাবে আরও পোক্ত হয়– 'শত মেয়ের' জন্ম দেবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। শত না হলেও, বছর ঘুরতে

না ঘুরতেই আবারও জন্ম দেই কন্যা সন্তানের, এবং সেই লোকমানের ঔরসেই। শাশুড়ি বংশরক্ষার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলের পুনর্বিবাহের কথা তুললে নেশাগ্রস্ত আবুল ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর চুপ থাকতে পারে না মতিজান, শাশুড়ির মুখে 'বংশের বাত্তি'র কথা শুনে 'খি খি করে হেসে' বলেই ফেলে- 'বংশের বাত্তি? থুঃ - আপনের ছাওয়ালের আশায় থাকলে হামি এই মাইয়া দুইডাও পেত্যাম না।'

নবনীতা দেবসেন তাঁর *ভালোবাসার বারান্দা*-য় লিখেছেন–

> 'বিশ শতকের কলকাতাতে একক মা হয়ে জীবনযাপনে আমার, বা আমার সন্তানদের যে কোনোই সামাজিক অসুবিধা হয়নি এমনটা বলতে পারি না। তখন ব্যাপারটা ওই সীতা-কুন্তীর কাব্যিক ঠিকানাতেই আটকে ছিল, পাশের বাড়ির নবনীতাদের দোরগোড়া অবধি নামেনি। বিদেশ থেকে নিজের শহরে ফিরে এসে অস্থিমজ্জায় টের পেলুম আত্মীয়-বন্ধু সমাজে এই নতুন আমাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। দৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য নেই। টের পেয়ে তখন একের পর এক কয়েকটি অভিজাত ক্লাবে সপরিবারে সদস্য হতে চেষ্টা করেছিলুম। শুনলাম কোনোটিতেই সিঙ্গল মেয়েদের নেওয়া হয় না, সে শিক্ষাজীবী দুই সন্তানের মা হলেও না। স্বামী চাই।'[১১]

নবনীতা দেবসেনের মতো অন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বকে যদি বিবাহবিচ্ছিন্না অবস্থায় দুই কন্যা নিয়ে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তবে গ্রাম সমাজে মতিজানের পরবর্তী পরিণতি আমাদের শঙ্কিত করে। মনে রাখতে হবে নবনীতা দেবসেন সম্পাদিত 'সই' গল্প-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পটি। মায়ের কোলে বসে সেই শিশুদুটির 'জ্বলজ্বলে চোখে' সবার তাকানোর মধ্যে দিয়েই গল্পের সমাপ্তি। সেই উজ্জ্বল-আঁখিদ্বয় যেন উপেক্ষা করছে সমাজের চোখ রাঙানি, একই সঙ্গে নারীর যৌন-স্বাধীনতার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই মতিজান চরিত্রের নির্মাণ।

'ভাল মেয়ে হল সেই মেয়ে, যার যৌনতা হবে পুরুষের শর্তে' শীর্ষক রচনার উষসী চক্রবর্তী লিখেছেন–

> 'আসলে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে, ভাল মেয়ে হল সেই মেয়ে, যার যৌনতা হবে অন্যের ইচ্ছে অনুযায়ী। পুরুষের শর্তে, পৌরুষের শর্তে। ছেলেরা তাই পাতার পর পাতা মেয়েদের শরীরের বর্ণনা দিলে দোষ হয় না, কিন্তু মেয়েরা যদি 'ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক' লিখে বসে, দোষ হয় খুব, কারণ তাতে পুরুষদের ভালো মেয়ে তৈরির কারখানায় হরতাল হয়।'[১২]

এই প্রথাগত 'ভালো মেয়ে'-র বাইরে এসে মতিজান বা পারুল চরিত্রের নির্মাণ করে মেয়েদের স্বাধিকারের পথে বেশ কয়েক-পা এগিয়ে দিয়েছেন সেলিনা হোসেন। মতিজান অতি সাধারণ দরিদ্র পরিবারের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে তেমনই এক পরিবারে। স্বামী শাশুড়ি নিয়ে সংসার; বিদ্রোহিনী হলেও তার আচরণে কিছু সীমারেখা ছিলই। স্বামীর অবহেলা পেয়ে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, ভালোলাগার পাশাপাশি ভালোবাসা কতখানি ছিল সেখানে, গল্পকার সে দিকে বিশেষ আলোকপাত করেননি। তবে তারই ঔরসে দুই কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিল মতিজান। কিন্তু 'পারুলের মা হওয়া' গল্পে প্রধান চরিত্র স্বামীর কাছে অবহেলিত হয়ে কামনার কালিদহে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আপাতভাবে সেখানে নারীর স্বেচ্ছাচারিতা বড় হয়ে উঠেছে মনে হলেও গভীর বিশ্লেষণে বোঝা যায় স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম এবং সেখানে প্রত্যাখ্যাত হওয়া,

পরিপূরক এই দুটি বিষয়ের সংযোগে পারুলের 'হৃদয়ক্ষত' তাকে 'স্বাধীনভর্তৃকা'য় পরিণত করেছে।

'আমি ও আমার সময়' শীর্ষক রচনায় কথাকার সেলিনা হোসেন লিখেছেন–

> 'ভেবেছিলাম সেই সময়ের কথা লিখবো, যা একান্তই আমার, যাকে আমি ভরিয়ে তুলি দিনরাতের সমুদ্রমন্থনে, যার জন্য আমার প্রতিমুহূর্তে বয়স্ক হওয়া, যা আমার শ্রম ও যন্ত্রণা এবং ইটের ভাটার মতো লাল হয়ে ওঠা আগুনে পোড়ানো সুখ। সব মানুষের বুকের ভেতরেই সময় লুকিয়ে থাকে। সৃষ্টিশীল লেখকেরা তাকে বর্ণাঢ্য করে। এই রং মেলানোর খেলার জন্যই সে অন্যের চাইতে আলাদা। সেজন্য লেখকের নিজের বলে কোনো সময় থাকে না। তা সবার হয়। ভেবে দেখেছি আমিও আমার সময়কে নিজের বলে ধরে রাখতে পারিনি। সেটা অনেকের হয়ে উঠেছে।'[১৩]

এই সময়ের বহুস্বরে কলমকে আরও শাণিত করে বিশের কথাকার সেলিনা হোসেন একুশ শতকের নতুন আখ্যানে সংযোজন করেন নবতর প্রশ্ন, নারীর জীবন-জিজ্ঞাসাকে আশ্রয় করে *নারীর রূপকথা* নামে তার গল্প-সংকলন প্রকাশ পায়, যার অন্তর্ভুক্ত হয় 'পারুলের মা হওয়া' গল্পটিও।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পারুল, সে 'লবন দেশের মেয়ে', সন্দ্বীপের চরে তার বেড়ে ওঠা। সেখান থেকেই তাকে বিয়ে করে এনেছিল নোয়াখালির আব্বাস আলি। তাদের সংসার জীবনে অর্থের অভাব থাকলেও দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রতি পারুলের কোনো অভিযোগ ছিল না। বরং সংসারকে সুস্থভাবে সচল রাখার জন্য রোজগারের পথে নেমেছিল পারুলও। এই সবই করেছল সে 'জোয়ান-তাগড়া' লোকটাকে ভালোবেসে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্বামী নিরুদ্দেশ। মাস ছয়েক স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছে সে, কানে এসেছে নানা গুজব- কেউ বলেছে আব্বাস সাগরে ডুবেছে, কারোর মুখে শুনেছে লোকটি ঢাকায় আছে। এসব নিয়ে পারুলকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, যার ফলে রাগে তার 'রক্ত চিড়বিড়িয়ে ওঠে'। কিন্তু যখন উপজেলা পরিষদের সামনে আলম চাচার মুখে শোনে যে আব্বাস মনপুরার চরে গিয়ে নতুন সংসার পেতেছে, চাষ-আবাদ করছে তখন 'নারীত্বের অবমাননায়' জ্বলে যায় পারুলের শরীর। যতই 'উজ্জ্বল' মুখে এই ঘটনাটিকে 'খুশির খবর' বলুক, তার 'হাসি'র ভেতরেই চাপা পড়ে থাকে গভীর 'কান্না'।

পারুলের স্বামীপ্রেম আছে, কিন্তু তা ভাবালুতায় ভরা নয়। এমনকি তার শরীরী চাহিদাকেও অস্বীকার করেননি গল্পকার। আব্বাসের চলে যাবার কারণ অনুসন্ধান করে চলে সে- 'মানুষের প্রয়োজন মানুষের কাছে কখন ফুরিয়ে যায়?' উত্তর খুঁজতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পারুল। সেই প্রতিবাদ নিঃসঙ্গ পারুলের বিভিন্ন আচরণে প্রকাশ পায়- কুঁড়েঘরের বাঁশের খুঁটি ধরে নাড়ে। ফাঁক হয়ে থাকে ঘরের চাল। এ শুধু পারুলের দারিদ্র্য নয়, ভগ্ন দাম্পত্যের প্রতীকও বটে। 'সামাজিকভাবে কবুল্লড়া স্বামী' তাকে ছেড়ে গেছে- সেই স্বামী, যার সন্তান গর্ভে ধারণ করলে সমাজ চোখ রাঙাত না; কিন্তু আব্বাসের উপেক্ষা ক্ষিপ্ত করে তুলেছে পারুলকে- 'টানটান হয়ে যায় ওর শরীর। কেবলই মনে হতে থাকে ওর করোটি শূন্য হয়ে যায় এই ভেবে যে লোকটা কোনও কারণ ছাড়া ওর নারীসত্তাকে উপেক্ষা করেছে। এই অপমান ওকে তীব্রভাবে দহন করছে। ও ওর টানটান শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তীব্র কণ্ঠে গালি ছুঁড়ে দেয় অদৃশ্যে। ও কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গি দিয়ে প্রতিবাদ করে। চাই না এ জীবন। চাই হাসিখুশি-ভোগ-বেপরোয়া সমাজকে লাথিমারা জীবন।' দুদিন পর থেকেই শুরু হয় প্রতিবাদ। উপজেলা

পরিষদের অধীনে রাস্তায় মাটি ফেলার কাজে যোগ দেয় পারুল, বিনিময়ে পাবে গম। তারার মায়ের কথায় প্রথমে বিড়িতে অনিচ্ছুক টান দিলেও পরে নিজেই বিড়ি কেনে। রাতে গম ভাজার সঙ্গে টান দেয় বিড়িতে আর গান ধরে।

আলম চাচার মুখে স্বামীর দ্বিতীয় পরিবারের খবর শুনে তার ক্ষোভ শুধু ধূমপানে প্রশমিত হয়নি। স্থির করে নেয় পারুল নিজের লক্ষ্য। মাত্র দু-মাস পরেই স্বামীহীনা পারুল গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ স্বামী নয়, অন্য কোনও পুরুষের সন্তান সে গর্ভে ধারণ করেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই উদাহরণ বিরল এমন বলা যায় না। এমনভাবেই তো সুচিত্রা ভট্টাচার্যের *কাছের মানুষ* উপন্যাসে আদিত্যর স্ত্রী ইন্দ্রাণী বিয়ের পর দ্বিতীয়বার গর্ভে ধারণ করেছিল প্রেমিক শুভাশিসের সন্তান। অর্থাৎ তার প্রথম পুত্র সন্তানটি বাপ্পা স্বামীর ঔরসজাত হলেও, কন্যা তিতির শুভাশিসের। 'পাশের ঘরে' ইন্দ্রাণীর অসুস্থ ভাই তনুময়, অন্য ঘরে 'মিলিত হচ্ছে নারীপুরুষ'-

> 'যাকে সে পাগলের মতো চেয়েছিল, তাকে পেল না। যাকে পেয়েছে, তাকে সে এতটুকু চায় না। প্রার্থিত পুরুষ আবার ফিরে এসেছে। এখন সে কী করে? পরদিন আবার গেল। পরদিন আবার। কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে প্রতিবাদের বর্ম। শুভাশিস ইন্দ্রাণীকে ফেলে চলে গেছে, শুভাশিস ছন্দাকে বিয়ে করেছে, এরপর আর তো ইন্দ্রাণীর কামনা থাকার কথা নয়। তবু বাসনা জ্বলে উঠল দাউ দাউ। ... সংযম ভুলে। সংসার ভুলে। রাত্রি দিন এক হয়ে গেল। পরপর দু'রাত ঘরে ফেরা হল না ইন্দ্রাণীর।'[১৪]

দিদির অবৈধ প্রণয়ের মিলনদৃশ্য দেখেও ফেলেছিল তনুময়, তার 'বিস্মিত চোখ' ভরে ছিল ঘৃণায়। তাই ইন্দ্রাণীর তিতিরকে শুধু প্রেমের নয়, 'লোভের ফসল' বলেও মনে হয়েছিল। সেই সন্তানকে গর্ভে হত্যা করতে চেয়েছিল। আবার অন্যরকম স্বপ্নও দেখেছিল–

> 'তিতির যখন পেটে এসে গেল, তখনই যদি সংসারটাকে লাথি মেরে চলে যেতে পারতাম! তুমি, আমি আর আমাদের একমাত্র মেয়ে... তিন জনে মিলে একটা অন্য ধরনের জীবন...'[১৫]

কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, কারণ শুভাশিসের জন্য যেমন ইন্দ্রাণীর 'এক কুঠুরি' ভালোবাসা ছিল, আদিত্যর কুঠুরিও সে খালি রাখেনি। কিন্তু নাগরিক জীবনবৃত্ত বা তার সূক্ষ্ম-মার্জিত চেতনার চেয়ে অনেকখানি দূর অবস্থান নোয়াখালির পারুলের। অন্য পুরুষের ভ্রূণ সে গর্ভে নিলেও ইন্দ্রাণীর মতো প্রেম নয়, পারুলের অন্তরে ছিল প্রতিশোধের তীব্র আগুন। তার ক্ষোভ শুধু এক আব্বাসের বিরুদ্ধেই নয়, প্রথাগত সমাজ ব্যবস্থার সম্মুখে এক বলিষ্ঠ জেহাদ।

গর্ভবতী পারুল তার সন্তানের পিতৃপরিচয়ও প্রকাশ করতে চায়নি। সে নিজেই তো সন্তানের মা এবং বাবা- সন্তানের পিতৃপরিচয়ের ধার ধারে না। কারণ 'শরীরের দাবি মেটানোর জন্য ওর যাকে পছন্দ হয় তাকেই প্রশ্রয় দেয়। যার সঙ্গ ওর ভালো লাগে সেটা ওর আনন্দ- সন্তানের পিতা নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। ও পিতৃত্বের অধিকার দিতেও চায় না। সোজাসুজি বলে দেয়, আঁই হোলাহান মানুষ কউরুম। ভাত দিউম, কাপড় দিউম। বাপ দি করিউম কী?'– এখানেই পারুলের প্রতিশোধেচ্ছা যুক্তিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। তর্ক করতে গিয়েও 'ক্ষান্ত' হয় অনেকেই। কিন্তু পারুল সমর্থন পায় না, এমনও নয়। যে সব মেয়েরা বাচ্চাসহ স্বামীর কাছ থেকে পরিত্যক্ত

হয়েছে তারা গোপনে বাহবা দিয়েছে পারুলকে। নিজেদের চাপা পড়া প্রতিবাদ যেন প্রকাশ পেয়েছে পারুলের মধ্য দিয়ে- 'ভালা কইচ্ছছ। আমরা ময়মুরুব্বির ডরে কথা কইতাম হারি না। তুই কামের কাম কইচ্ছছ পারুইল্যা। অহন হোদ্দলাগুলা বড় গলায় কথা কইতে হারে না।' এই সমর্থনে পারুলের 'অপমানের জ্বালা'য় কিছুটা 'সান্ত্বনার প্রলেপ' পড়ে। এমনকি সেই সব মেয়ের দল পারুলকে ছেঁড়া শাড়ি, কিছু খাবার উপহার হিসেবে দিয়ে যায়। আর পারুল 'বিভোর' হয়ে থাকে মা হওয়ার স্বপ্নে- 'তাই ওর শরীরে কাম-ইচ্ছা নেই। ও নারী, এখন ও প্রকৃতির কাছে নতজানু। বিশাল প্রকৃতি ওর আপন সত্তাকে গৌরব অহংকারে ভরে দিয়েছে ও সেই সাধনার ধন ঘরে তুলবে।'

এই সন্তান নিজের ঔরসজাত কিনা, সেই খোঁজ গোপনে নিতে আসে পারুলের শয্যাসঙ্গীরা। পারুল অবশ্য সে খবর প্রকাশ করে না। চরম অবহেলায় ফিরিয়ে দেয় তাদের, 'গেদুর বাপ' হিসেবে কাউকেই চিহ্নিত করে না। কারণ পারুল জানে- 'পুরুষ মানুষগুলো পিতৃত্বের কর্তৃত্ব চায়। আর কিছু না, সন্তানকে লালন পালন নয়- ওকে নিজের কাছে নেবে না- প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে স্বীকার করবে না। শুধু জেনে আনন্দ পেতে চায় যে পারুলের গর্ভে তারই সন্তান। হায় পুরুষ মানুষ।' প্রতিশোধ আর প্রতিবাদের মাঝে পারুলের মধ্যে আছে সম্ভ্রমবোধ- সে কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময়ে শরীর বিক্রি করে না, সে 'ভোগ' করে শুধুমাত্র নিজের আনন্দে- 'যখন ইচ্ছে হয় তখন'। 'বিচ্ছিন্ন নারীর মুক্তির আনন্দ' প্রসঙ্গে মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর গবেষণা গ্রন্থে লিখেছিলেন–

> 'অসুখী বিয়ের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন নারী যে মুক্তির আনন্দ অনুভব করে, সেটাই নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদের সবচেয়ে ইতিবাচক ফলাফল। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও এই মুক্তির স্বাদ তাকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। ৮টি পাঠ্যেই আনন্দের প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখা যায়, আমাকে চাই, সাতকাহন, সাদা বেড়াল কালো বেড়াল, শ্যাওলা, ধূলিবাস, রণক্ষেত্র, দিন যায় রাত যায় ও শীর্ষবিন্দুতে।'[১৬]

পারুলের স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে ভিন্ন পটভূমিতে, তার সামাজিক অবস্থানও ভিন্নতর, তবু সম্পর্কের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে জীবনকে নতুনদৃষ্টিতে দেখেছে সে, পারুল বাঁচতে চেয়েছে 'নিজের শর্তে'।

১৯৯২ সালে বাংলাদেশের পটভূমিতেই প্রকাশ পেয়েছিল তসলিমা নাসরিনের *শোধ*, একলা মেয়ের জীবন সংগ্রাম ও প্রতিশোধের উপন্যাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ঝুমুর ভালোবেসে বিয়ে করেছিল হারুনকে, বিয়ের পর স্বামীর ভিন্ন চেহারা দেখেছিল সে। শ্বশুরবাড়িতে সে প্রায় বন্দিনী, এমনকি তার প্রথম সন্তানকে গর্ভেই হত্যা করেছিল স্বামী মিথ্যে সন্দেহে। এতখানি অপমানের পরেও ঝুমুর বিবাহবিচ্ছেদ চায়নি, সমাজে বিবাহবিচ্ছিনাদের পরিণতি তার কাছে খুব ইতিবাচক নয়। স্বামীর অজ্ঞাতে নিচের তলার ভাড়াটে চিত্রকর আফজলের 'প্রচণ্ড পৌরুষ'-এর কাছে নিজেকে সঁপে সন্তান ধারণ করেছে ঝুমুর। হারুন সেই সন্তান আনন্দকেই নিজের সন্তান বলে আঁকড়ে ধরেছে। ঝুমুরের অভিজ্ঞতার সূত্রে নারী জীবনের বহুমাত্রিক সত্যকে তুলে ধরেছেন তসলিমা। উপন্যাসের শেষে ঝুমুরের ভাবনা–

> 'আনন্দের জন্মের জন্য আমার কোনও অপরাধবোধ নেই। আমাকে অপমান করার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। এত নগণ্য তুচ্ছ মানুষ নই আমি যে একজন আমার গালে অযথা চড় কষাবে, আর আমি হজম করব তা, একজন আমাকে ধুলোয় মেশাবে আর আমি তাকে মাথায় তুলে পুজো করব। আনন্দকে যখন বাপ বাপ বলে

হারুন আদর করে আমার ভেতরে তখন সুখের ফোয়ারা ওঠে। সেই যে হারুনের অবিশ্বাসের আগুনে আমি পুড়েছিলাম, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পুড়েছিলাম, সেই আগুন, আমাকে পোড়ানো আগুন এখন আমি সুখের জলে নেভাই।'[১৭]

মতিজান বা পারুলের অবস্থান ঝুমুরের চেয়ে অনেকখানি আলাদা। কিন্তু স্বামী বা সংসারে তাদের একইভাবে অপমানিত হতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থেকে নিরক্ষর বধূ, সমাজ তাদের কাছে একইভাবে সতীত্বের দাবি জানায়। ঝুমুর প্রতিশোধ নিয়েছে গোপনে, কৌশলে। সে নাগরিক শ্রেণির প্রতিনিধি। অন্যদিকে গ্রামের দরিদ্র বধূ মতিজান বা পারুল, তাদের মনের জ্বালাপোড়া কিংবা প্রতিশোধস্পৃহা ঝুমুরের চেয়ে কম নয়, এবং প্রকাশভঙ্গি আরও স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। ঝুমুরের প্রতিবাদ যেখানে ব্যক্তিগত তৃপ্তি আনে মাত্র, মতিজান বা পারুল সেখানে সমাজে আলোড়ন তোলে। ঝুমুর তার জীবনের সত্যকে আড়াল করেছে, আর এই দুই নারীর কাছে সেই সত্যই তাদের শক্তি হয়ে দেখা দিয়েছে। মতিজান স্বামীকে অস্বীকার করেই সন্তান ধারণ করেছে, আর স্বামী-পরিত্যক্তা পারুল সন্তানকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু অস্বীকার করেছে সেই ব্যাভিচারী পুরুষদের পিতৃত্বকে, তাই পারুল বা মতিজান শুধু একলা-মা কিংবা 'অপরাজিতা'ই নয়, ভিন্ন এক নারীবিশ্বের সৃজনশিল্পী হিসেবেও চিহ্নিত করা যায় তাদের।

সূত্র সংকেত

১. প্রতিভা বসু, *মহাভারতের মহারণ্যে*, বিকল্প, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৫৩

২. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *কৃষ্ণা কুন্তী কৌন্তেয়*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, একাদশ মুদ্রণ, ২০১৪, পৃ. ৩৮

৩. ঈলীনা বণিক, 'কুন্তীকথা' (প্রবন্ধ), *রোববার*, *সংবাদ প্রতিদিন*, ২০.০৭.২০০৮, পৃ. ১৬

৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'সেলিনামঙ্গল' (প্রবন্ধ), *প্রথম আলো*, ১৬.০৬.২০১৭ । (অন্তর্জাল)

৫. তদেব

৬. হাসান আজিজুল হক, *আগুনপাখি*, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ২৯

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দেনাপাওনা', *রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ২২

৮. তিলোত্তমা মজুমদার, *প্রেতযোনি*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৮, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ১২৭

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দেনাপাওনা', *রবীন্দ্র রচনাবলী ১০ম খণ্ড*, পশ্চমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি, কলকাতা, সার্ধশতবর্ষ সংস্করণ, ২০১৪, পৃ. ২৪

১০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, *লালসালু*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ১২৬

১১. নবনীতা দেবসেন, 'হবে নাকি একটু কুন্তীগিরি', *ভালোবাসার বারান্দা ২য় খণ্ড*, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ৬৫

১২. উষসী চক্রবর্তী, *মেয়েঘেঁষা লেখারা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৫১

১৩. সেলিনা হোসেন, 'আমি ও আমার সময়' (প্রবন্ধ)। পরোক্ষ তথ্য সংগৃহীত- তপোধীর ভট্টাচার্য, *কথাপরিসর :*

বাংলাদেশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ১৯৭

১৪. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *কাছের মানুষ*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০১৮, পৃ. ১৬৬

১৫. তদেব, পৃ. ৬২১

১৬. মল্লিকা সেনগুপ্ত, *বিবাহবিচ্ছিন্নার আখ্যান বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রতিভাস প্রকাশ, ২০১৭, পৃ. ১৫৮

১৭. তসলিমা নাসরিন, *শোধ*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ২০০২, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ. ১৩৯

আকর গ্রন্থ

১. সেলিনা হোসেন, 'পারুলের মা হওয়া', *পঞ্চাশটি গল্প*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০১৪

২. সেলিনা হোসেন, 'মতিজানের মেয়েরা', নবনীতা দেবসেন (সম্পাদনা), *সই*, লালমাটি, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪২২